



ইসলামী বসন্ত (৩)
শায়খ আইমান আজ জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ)



অনলাইনে পড়ুন-

পিডিএফ ডাউনলোড করুন [৬৭৯ কেবি]

<https://alfirdawsweb.files.wordpress.com/2017/10/ib3-desktop.pdf>

<https://archive.org/download/ib3-desktop/ib3-desktop.pdf>

<https://www.pdf-archive.com/2016/05/21/ib3-desktop/>

<http://www.mediafire.com/file/wfenda5t3z6vuex/ib3-desktop.pdf/file>

https://archive.org/download/ib3-desktop_201906/ib3-desktop.pdf

https://mega.nz/file/IE4VXBga#ngAyCrJErUOrnHEpwjT7NERwFeB61MIY1SXR_jNVk

ইসলামী বসন্ত – শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ)
[পর্ব – ৩]

ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনা ছিল ইরাক এবং শামে ক্রুসেড আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি আমেরিকানদের অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের করণীয় সম্পর্কে।

আমি এখানে এটা জোর দিয়ে বলেছি যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ক্রুসেড শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে টার্গেট করেছে এবং তারা ইসলাম ও মুসলমানদারকে পৃথিবীর বুকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। সুতরাং এই অপশক্তি রুখতে আমরা সকল মুজাহিদিনদের সাথেই আছি যারা আমাদের সাথে সন্ধ্যবহার করছে তাদের সাথে এবং যারা দুর্ব্যবহার করছে তাদের সাথেও। যারা আমাদের উপর জুলুম করছে এবং যারা ইনসাফ করছে, যারা আমাদের সম্মান নষ্ট করছে এবং যারা আমাদের সম্মান রক্ষা করছে ও যারা আমাদের সাথে বারাবাড়ি করছে এবং যারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করছে। যারা আমাদের অধিকার অস্বীকার করছে আর যারা স্বীকার করছে। যারা আমাদের সাথে অশালীন ভাষায় কথা বলছে আর যারা আমাদের সাথে সুন্দর কথা বলছে-

আমরা সকলের সাথেই আছি। কেননা বিষয়টি অনেক গুরুতর, আমাদের মধ্যকার সকল সমস্যার ঊর্ধ্বে। আমরা মুসলিম-উম্মাহ আজ ক্রুসেড আক্রমণের শিকার। এখন আমাদের পরস্পর একে অপরের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে এক হতে হবে।

আমার এ আহ্বানকে কেউ যেন ভুল ব্যাখ্যা না দেন যে, আমি এর মাধ্যমে বাগদাদীর খিলাফাহকে মেনে নিতে বলছি। বরং আমি পূর্বের ন্যায় আবারও বলছি এবং বারবার বলছি যে, আবু বকর আল-বাগদাদীর খেলাফতের ঘোষণা ভুল, এ ঘোষণা শুদ্ধ হয়নি। এ ঘোষণা শরীয়ত-সম্মত নয়। আর এটা খিলাফা আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহও নয়। তাই তাকে বাইয়াত দেয়া মুসলমানদের উপর জরুরী কিছু নয়। আর এই যে আমরা ক্রুসেড শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল মুজাহিদদেরকে এক কাতারে এসে উপনিত হতে বলছি এর মাধ্যমে আমরা বাগদাদীকে বাইয়াত দিতে বলছি না। বরং আমরা এ আহ্বান পূর্বেও করেছি এবং এখনও করছি যে, হে মুসলিম মুজাহিদ ভাইয়েরা এসো আমরা সকলে এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এশিয়া, রাশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এদের সকলের নেতা আমেরিকার ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করি। এসো আমরা একসাথে ইসরাইলের মোকাবেলা করি। আমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস উদ্ধার করি। এসো বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মুরতাদ ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারগুলোর মোকাবেলা করি। সাধারণ মুসলমানদের ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসি। এসো এ সকল শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মুসলমানদের গোপন ও প্রকাশ্য শত্রু ইরানের মোকাবেলা করি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হয়ে ধীরে ধীরে খিলাফা আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাই।

আর এ অধ্যায়ে আমার আলোচনার বিষয় হল, খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ এবং তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শন। এখানে আমি আমার আলোচনা একেবারেই সংক্ষিপ্ত করবো। আর যে আরো বিশদভাবে জানতে চায় সে যেন ফিকহের কিতাবসমূহ দেখে নেয়। বিশেষ করে ইসলামি রাজনীতি এবং ইসলামি ইতিহাসের কিতাবগুলো ভালোভাবে দেখে নেয়। আমি এখানে সংক্ষেপে শুধু মূলনীতিগুলো আলোচনা করব। বিস্তারিত নয়। আমি এখানে উল্লিখিত বিষয়ে নিম্নোক্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

১। খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ কি?

২। খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

৩। খলিফা নির্বাচনের শরয়ী পদ্ধতি কি?

৪। খলিফার প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য কি?

৫। কিছু সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর।

১। খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ কি?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ'র সংজ্ঞা করেছেন এভাবে-

‘মদীনায় যে সকল খিলাফা সংঘটিত হয়েছে তাই খিলাফাতুন নুবুয়্যাহ। অর্থাৎ নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।’(মিনহাজুস্ সুন্নাতিন নববিয়্যাহ- ৬/৫১)

ইমাম জারকাশি রহ. উক্ত সংজ্ঞার সাথে আরেকটু সংযুক্ত করে বলেন,

‘এটাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাজহাব। তার নিকট খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতই হল দলিল; এর উপর আমল করা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ বলেন, ‘মদীনায় যে সকল বাইয়াত সংঘটিত হয়েছে তাই নববী ধারার খিলাফাহ। আর এটা জানা কথা যে, মদীনায় কেবল আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলী রা. এর বাইয়াতই সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন বাইয়াত সংঘটিত হয়নি।’(বাহরুল মুহিত- ৩/৫৩১)

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের বাইয়াতের আলোকে যে খিলাফা গঠন হবে, তাই ‘খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ’। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের বাইয়াতের আলোকে যে বাইয়াত গঠন হবেনা তা খিলাফাহ আ'লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ নয়। সেটা অন্য কিছু। এরপর সেটাকে যে নামে খুশি সে নামে ডাকতে পারবেন। চাইলে

তাকে রাজতন্ত্র বলতে পারেন। জবরদখলের শাসনও বলতে পারেন। কিংবা সেটাকে বিশৃঙ্খলা ও স্বৈরতন্ত্র এবং আর অনেক কিছুই বলতে পারেন। কিন্তু সেটাকে ‘খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ’ বলতে পারবেন না।

২। খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি?

নববী ধারায় খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলঃ বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ শরীয়া নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। শরীয়াতের বাইরে কোন কাজ হতে পারবেনা। জনগণ সর্বান্তকরণে তার প্রতি আনুগত্য করবে। যিনি খলিফা হবেন তিনি জনগনকে এই আয়াতের উপর আমলের নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ তাআ’লা বলেন,

“মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।”(সূরা নূর- ৫১)

সুতরাং উম্মাহর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ যার ব্যাপারে মনে করবেন যে সে আসল শরীয়াতের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে না বরং শরীয়ী শাসনের আহ্বানকে প্রত্যাখান করে তাহলে তাকে বাইয়াত দেওয়া যাবেনা এবং সে যদি শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নিজেদের খলিফা দাবি করে তাহলেও সে খলিফা নয় এবং তার শাসন খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ নয়।

ইমাম মাওয়ারদী রহ. খলীফার দশটি অলঙ্ঘনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১। সঠিক-শুদ্ধ আকিদা বিশ্বাস।

২। বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করণ।

৩। ব্যাপকভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪। ইসলামের হুদুদ ও কিসাস প্রতিষ্ঠা করা।

৫। সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৬। শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখা।

৭। জাকাত ও সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করা।

৮। ভাতা নির্ধারণ ও তাঁর সুষম বন্টন।

৯। প্রশাসনিক কাজে জিম্মাদার নিযুক্ত করা।

১০। সার্বিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা তদারকি করা।

এরপর মাওয়ারদী রহ. বলেন, ‘ইমাম যখন জনগণের এ সকল হুক আদায় করবে তখন এর মাধ্যমে তিনি তার উপর আরোপিত আল্লাহর হুক আদায় করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার এ অবস্থা পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণের উপর তার দুটি হুক থাকবে- ১। তার আনুগত্য করা। ২। তাকে সাহায্য করা।(আল আহকামুস সানিয়াহ- ২৭)

সুতরাং খেলাফতের দাবিদার লোক যদি তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে এ সকল দায়ত্ব ঠিকমত আঞ্জাম দিতে না পারে- তাহলে সে খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়।

অথচ মুসলিম অঞ্চলসমূহে তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল একেবারেই কম। তাও আবার সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি। জাকাত উসূল এবং তা জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়নি। সে পূর্ণ রূপে এ অঞ্চলসমূহ শত্রুমুক্ত করতে পারেনি। সেখানে তার শক্তি প্রতিনিয়ত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে। তাহলে সে কিভাবে ধারণা করে যে সে সারা দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশসমূহের খলীফা!

অনেক মুসলিম ভূমি এমনকি তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহেও তো অন্য মুজাহিদ গ্রুপের কর্তৃত্ব চলে। সেখানে তারা শরীয়াতের অনেক হুকুম বাস্তবায়ন করছে। যেমন শরীয়াতের বিচারকার্য পরিচালনা, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার এবং জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও তারা সেখানে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের অঞ্চলে তার কোন কতৃত্ব নেই। আর তারা তাকে বাইয়াতও দেয়নি। তাহলে এ দাবির কি যৌক্তিকতা যে সে নেতৃত্বের অধিক হকদার। সে কেবল তার আশ পাশের গুটি কয়েক লোকের বায়াতের ভিত্তিতে খিলাফাত দাবি করেছে। সে তো খিলাফাহ দাবির পূর্বেও মানুষের নিকট তাদের হুক পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়নি। তাহলে সে

কিভাবে এখন তাদের বাইয়াত, আনুগত্য ও সাহায্য কামনা করে? খিলাফতের দাবিদার ব্যাক্তির যখন খিলাফতের দুটি রুকন তথা 'বাইয়াত এবং তার হকসমূহ আদায়ের সক্ষমতা অর্জন হয়নি'। তাহলে বেশি থেকে বেশি তাকে এটা বলা যাবে যে, সে মুসলমানদের কিছু অঞ্চল জবরদখল করে আছে। আর সেখানে তার নেতৃত্ব হল জবরদস্তির নেতৃত্ব। তার জন্য এমন কোন পদের দাবি করা কখনোই ঠিক হবে না যার প্রথম শর্তই পূর্ণ করতে সে সক্ষম হয়নি।

সেটা হল বাইয়াত। তাহলে সে কিভাবে দ্বিতীয় শর্তের ভার বহন করবে অর্থাৎ খিলাফতের হুকুম সমূহ আদায়ে সক্ষম হবে।

খিলাফাহ হল এক সুমহান দায়িত্ব ও নেতৃত্বের নাম। এটা দলিল ব্যাতিত শুধু দাবির নাম নয় এবং বাস্তবতা বর্জিত কোন ধারনার নামও নয়। বরং এতো এমন কিছু বাস্তবতা যা শরয়ীভাবে খিলাফা প্রতিষ্ঠার জন্য এই বাস্তব পৃথিবীতে পূর্ণ থাকতে হবে। তাহলেই এর সুফল পাওয়া যাবে। এটা আবেগ ও আকাংখার নাম না যে, শুধু কিছু নাম ও পদবীর ব্যবহারেই বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। শরীয়তে কেবল বাস্তবতারই মূল্য আছে; নাম ও পদবীর কোন মূল্য নেই। এখানে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে সামনে আসে তা হলঃ বাস্তবজগত যখন এখনো অনুকূলে নয় তাহলে এই নাম ও পদবী নিয়ে এতো তাড়াহুড়ো কেন?

বাস্তব কথা হল আমরা এখনো মুসলিমদের উপর আক্রমণকারী শত্রুর মোকাবেলায় প্রথম ধাপে আছি। আর কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলমানদের সামান্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু তা খিলাফাহ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছি। আমাদের উচিত হবে অবাস্তব পদবী ও উপাধির পিছে না পড়ে নিজেদের চলমান ইসলামী জিহাদের কাঠামোকে সুদৃঢ় করা, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান।

বাস্তবতা বিবর্জিত অন্তঃসার শূন্য পদ-পাদবীর পিছনে না ছুটে আমাদের উচিত চলমান ইসলামী জিহাদের কাঠামোকে সুসংহত করার দিকে মনোযোগী হওয়া; যার নেতৃত্বে রয়েছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। এটা না করে উল্টো তার অবাধ্যতা করা, তাদের অগ্রণী ভূমিকাকে অস্বীকার করা, তার সুন্দর কর্মগুলোর কুৎসা রটনা করা- শুধু তাই নয়, ইমারার সৈনিকদেরকেও অযৌক্তিকভাবে বাইয়াত ভঙ্গের উৎসাহ- জানতে পারি এতসব কিছু কাদের কল্যাণে করা হয়েছে? খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পন্ন হয়েছে কিনা, না হলে অস্থায়ী ব্যবস্থা কি হতে পারে; খিলাফা প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী পন্থা কোনটি- এসব আলোচনায় পরে আসছি।

৩। খলিফা নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি কী?

খলিফা হওয়ার জন্য শর্ত হল, তার প্রতি মুসলমানদের সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আর খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি দুইটি- ১। উম্মাহের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম আলেম ও চিন্তাশীলদের পরামর্শের মাধ্যমে। ২। পূর্বের খলীফা কাউকে নির্ধারণ করার মাধ্যমে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সন্তুষ্টি শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি এমনই ছিল।

বুখারী শরীফে এসেছে আবু বকর (রা) আনসারদের সামনে দলীল হিসেবে বললেন,
“এ বিষয়টি (খিলাফাহ) কুরাইশের এ গোত্রের জন্য নির্ধারিত।”(সহীহ বুখারী- ৬৩২৮)

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে এসেছে,

“আরবরা এ বিষয়টি (খিলাফাহ) কুরাইশের লোক ব্যতীত অন্য কারো জন্য মেনে নেবে না। কেননা তারা অঞ্চলের দিক থেকে এবং বংশের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।”(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৫/৯৭৫৮)

অর্থাৎ আবু বকর (রা) তাদের সামনে দলীল পেশ করলেন যে, সকল মুসলমান (তখন মুসলমান শুধু আরবেই ছিল) কেবল কুরাইশের কোন লোকের প্রতিই সন্তুষ্ট হবে। কারণ তারাই নিসাব ও নসব তথা বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ। অন্য স্থানে একেবারেই এ শব্দেই হাদিস এসেছে,

“সাধারণ মুসলমানের (তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন ইসলামী উম্মাহের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম ও আলেম ও চিন্তানায়কগণ) অধিকার রয়েছে যে, তারা এমন লোককে খলিফা নির্ধারণ করবে যার মধ্যে খিলাফতের শর্ত সমূহ বিদ্যমান।

আর ঠিক এ বিষয়টি মদীনা মুনাওয়ারায় এক খুতবায় খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. স্পষ্ট করে বলেছেন,

“আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অনেক মুহাজিরদের কেরাত পড়াতাম তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা.ও ছিলেন। আমি তখন মিনায় তাঁর বাড়িতে ছিলাম আর তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সাথে ছিলেন। এটা ছিল ওমর রা. এর জীবনের শেষ হজ্ব। আব্দুর রহমান আমার নিকট ফিরে এসে বললেন,

‘তুমি যদি ঐ লোকটিকে দেখতে পেতে যা আজ আমীরুল মুমিনীর নিকট এসেছিল। সে তাঁর নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি অমুক লোকের ব্যাপারে কি বলেন? যে বলে, ওমর ইন্তেকাল করলে আমি অমুককে বাইয়াত দিবো। আল্লাহর কসম আবু বকর রা. এর বাইয়াত তো ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র আর এটা পূর্ণ হয়েছে।’ হযরত ওমর রা. তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ আজ সন্ধ্যায় আমি মানুষকে ঐ সকল লোকের ব্যাপারে সতর্ক করবো যারা মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। আব্দুর রহমান রা. বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি দয়া করে এমনটি করবেননা। কারণ এই মৌসুমে অনেক সাধারণ লোক এবং উচ্ছৃংখল লোক একত্রিত হয়েছে। নিশ্চয় আপনি যখন খুতবা দিতে দাঁড়াবেন তখন তারাই আপনার আশে পাশে থাকবে। আর আমার ভয় হয় যে প্রত্যেকেই আপনার কথা না বুঝে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে এবং সেটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে।

সুতরাং আপনি মদীনায় ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নিশ্চয় মদীনা দারুল হিজরত এবং সেখানে আছে অনেক ফকীহ ও সূফী মানুষ। আপনি নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবেন। কারণ আহলে ইলমগন আপনার কথা বুঝতে পারবে এবং তারা তা যথাযথ ব্যাখ্যাই করবে। অতঃপর ওমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ আমি মদীনায় ফিরে যে খুতবাটি দিব তা এই খুতবাই হবে।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন অতঃপর (মদীনায় ফিরে আসার পর) ওমর রা. মিসরে উপবেশন করলেন এবং যখন মুয়াজ্জিন আজান শেষ করলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তাআ’লার প্রশংসা করার পর বললেন, ‘আজ আমি আপনাদেরকে এমন একটি কথা বলবো যা বলা আমার দায়িত্ব। মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু সমাগত! সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কথা ভালভাবে বুঝতে পারবে সে যেন তার সাধ্যমত মানুষের কানে পৌঁছে দেয়। আর যে বক্তব্য যথাযথ বুঝতে পারবেনা তাহলে আমি এমন কাউকে আমার নামে মিথ্যা প্রচারের অনুমতি দেইনা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, ‘আমার নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে এক লোক এমনটি বলেছেন, আল্লাহর কসম ওমরের ইন্তেকালের পর আমি অমুককে বাইয়াত দিবো। কেউ যেন এর দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে যে, ‘আবু বকর রা. এর বাইয়াত ছিল আকস্মিক বাইয়াত। আর তা শেষ হয়েছে।’ হ্যাঁ এটা এমনই ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআ’লা একে মন্দ থেকে হেফাজত করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে তো আবু বকর রা এর মত জনপ্রিয় কেউ নেই। যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কারো হাতে বাইয়াত হল, তাদের কারো (বাইয়াত দাতা ও গ্রহীতা) বাইয়াত কার্যকর হবেনা। কারণ তাদের উভয়েই হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে। তখন অনেক শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছিলো- না জানি বিশৃঙ্খলা বেঁধে যায়। তাই আমি বললাম, হে আবু বকর আপনার হাত প্রসারিত করুন। অতঃপর তিনি তার হাত প্রসারিত করলেন আর আমি তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহন করলাম অতঃপর মুহাজিরগন বাইয়াত গ্রহন করলেন তারপর আনসারগন বাইয়াত গ্রহন করলেন।”(সহীহ বুখারী- ৬৩২৮)

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার মধ্যে এসেছে,

‘আমি জানতে পেরেছি কিছু মানুষ বলাবলি করে, ‘আবু বকরের বাইয়াত ছিল আকস্মিক ঘটনা।’ হ্যাঁ এটা আকস্মিকই ছিল। কিন্তু আল্লাহ এর মন্দ থেকে রক্ষা করেছেন। জেনে রেখো, মশওয়ারা (পরামর্শ) ব্যাতীত কোন খিলাফাহ নেই।

মুসনাদে আহমদে এসেছে,

‘যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যাতীত কোন আমীরের বাইয়াত দিলো। তাহলে বাইয়াত দাতা ও গ্রহিতা কারো বাইয়াত কার্যকর হবেনা। কারণ, এরা উভয়েই হত্যাযোগ্য কাজ করেছে।’ (মুসনাদে আহমদ- ৩৯১)

আশা করি আপনারা ওমর রা. এর এই খুতবা নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করবেন। তাঁর খুতবাটি ছিল উম্মাহের নেতৃবর্গ, মদীনার অনেক ফকীহ, চিন্তাবিদ, আলেমদের সামনে। যেমনটি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. ওমর রা. কে সতর্ক করেছিলেন। আর ওমর রা. মুসলমানদেরকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং আকলমন্দ ও বোদ্ধাদের অনুযায়ী এটা পৌছে দিতে বলেছেন। এটা অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা যা বহু সাহাবায়ে কেরামদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে। যারা ছিলেন মুসলিম উম্মাহের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়ক। তাদের কেউই এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেননি। এটা সাহাবায়ে কিরামের ইজমার মতই। কারণ, এতে কেউই ভিন্নমত পোষণ করেননি।

ওমর রা. এই গুরুত্বপূর্ণ খুতবাটি দিয়েছিলেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে।

১। যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যাতীত বাইয়াত নিবে সে মুসলমানদের হক ছিনতাই করলো।

২। যে ব্যক্তি এমনটি করবে তার ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক থাকতে থাকতে হবে।

৩। তাদের বাইয়াত দেওয়া এবং নেওয়া কোনটি সঠিক নয়।

৪। তার নির্দেশের অনুসরণ করা কারো জন্য জরুরী না।

৫। আবু বকর রা. এর বাইয়াত ছিল আনসার ও মুহাজিরদের সর্ব সম্মতি ক্রমে।

৬। বাইয়াত সংঘটিত হবে উম্মাহের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কদের ঐক্য মতের ভিত্তিতে। নাম পরিচয় কিছু মুখ ও অপরিচিতদের মাধ্যমে নয়। আর সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেমগন তখন মদীনাতেই ছিলেন।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে আরো এসেছে, ওমর রা. বলেন, ‘ইমারা মজলিসে শুরার মাধ্যমে গঠিত হয়।’

ইমাম বায়হাকী রহ. সুনানে কুরবাতে উল্লেখ করেছেন, ওমর ইবনে খাত্তাব রা. মৃত্যুর পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম রা. দের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে তোমরা তাড়াহুড়া করোনা। বনী জাদআনের গোলাম সুহাইব তিন দিন ইমামতি করবে। অতঃপর তৃতীয় দিনে শ্রদ্ধাভাজন আলেম, সুখি জনতা ও সেনাপতিরা মিলে তোমাদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করবে। আর পরামর্শ ব্যাতীত যে আমীর হবে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।’ (বায়হাকী- ১৭০২২)

বুখারি শরীফে এসেছে, উসমান রা. এর বাইয়াতের সময় আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ রা. আলী রা. কে বললেন,

‘হে আলী! আমি মানুষের মতিগতি লক্ষ্য করেছি অতঃপর আমার কাছে উসমানের সমকক্ষ আর কাউকে মনে হয়নি। সুতরাং তুমি কিছু মনে করোনা। তখন আলী রা. বললেন, আমি তার হাতে বাইয়াত দিচ্ছি আল্লাহ ও তার রাসুলের বিধান মেনে এবং পূর্বের দুই খলিফার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এর পর আব্দুর রহমান এবং মুহাজির আনসার ও সেনাপতিগনসহ সর্বসাধারণের সবাই উসমান রা. এর হাতে বাইয়াত দেন।’ (সহীহ বুখারী- ৬৬৬৭)

এই হাদীসে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য পেয়েছি। তাহল শুধুমাত্র খিলাফতের তথ্যসমূহ বিদ্যমান থাকলেই সে খলিফা হতে পারবেনা। যতক্ষণ না উম্মাহর পক্ষ থেকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গরা তাকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করে। একটু লক্ষ করে দেখুন, ওমর রা. যে, ছয় জনকে নির্ধারণ করে ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিল খলিফা হওয়ার যোগ্য। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আলী এবং উসমান রা. কে নির্বাচন করা হয়েছে। অতঃপর এ দুজনের মধ্য থেকে উসমান রা. কে খলিফা বানানো হয়েছে। আলী রা. কিন্তু খলীফা হওয়ার

অযোগ্য ছিলেন না। এ কথা বলার সাহস কার যে, তিনি ছিলেন খিলাফতের অযোগ্য ; বরং তাঁর মধ্যেও খিলাফতের যোগ্যতা ছিল। কিন্তু উম্মাহ তাঁকে খলিফা না বানিয়ে অন্য আরেক আরেক জন খিলাফতের যোগ্য লোককে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

এই হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সিরাত। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট করতে পেরেছি যে, পুরো উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবর্গ, আলেম ও চিন্তানায়কগণ। তারা কোন বিষয় গ্রহণ করলে উম্মাহ সেটাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। আর তারা কোন বিষয় ত্যাগ করলে পুরা উম্মাহ সেটাকে ত্যাগ করবে। সুতরাং তারাই খিলাফতের যোগ্য লোকদের বাছাই করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়া এটাই ছিল এবং তিনি রাফেজীদের দাবিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখান করেছেন। রাফেজীরা আবু বকর রা. এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে যে, আবু বকর রা. কে সাহাবায়ে কেরাম রা. দের মধ্য থেকে মাত্র অল্প কয়েকজন বাইয়াত দিয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. হিলাকারী রাফিজীদের এ কথাকে খন্ডন করে বলেন ,

“যদি এটা ধরে নেওয়া হয় যে, ওমর রা. এবং হাতে গোনা কয়েকজন তাঁকে (আবু বকর রা. কে) বাইয়াত দিয়েছিলেন। আর অন্য সকল সাহাবি তাঁকে বাইয়াত দেওয়া হতে বিরত থেকেছেন। তাহলে সে তো এর মাধ্যমে ইমাম হতে পারতেন না। বরং তিনি অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের বায়াতের মাধ্যমেই ইমাম হয়েছেন। যারা ছিলেন প্রভাবশালী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। যারা বলে যে, তিনি ইমাম হয়েছেন দুই চারজন লোকের বায়াতের ভিত্তিতে এবং তারা আসলেই প্রভাবশালী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ নয় তাদের কথা ঠিক নয়। যে সকল জমহুর সাহাবীগণ রাসূল সা. এর কাছে বাইয়াত দিয়েছেন তারাই আবু বকর রা. এর কাছে বাইয়াত দিয়েছেন। আর ওমর রা. কে আবু বকর রা. নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সকল মুসলমানগণ তাঁকে (ওমর রা. কে) বাইয়াত দিয়েছেন তো সে একজন প্রভাবশালী ইমাম হয়েছেন। আর তাঁর (আবু বকর রা.) মৃত্যুর পর যদি তাঁকে বাইয়াত না দিতেন তাহলে তিনি ইমাম হতে পারতেন না। যদি বলা হয় যে, শুধু মাত্র আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. ওসমান রা. কে বাইয়াত দিয়েছেন। আর আলী সহ কোন সাহাবীই তাঁকে বাইয়াত দেননি। তাহলে তিনি ইমাম হলেন কিভাবে?”(মিনহাজুস সুন্নাতিন নুবুয়্যাহ- খণ্ড- ১/ ৩৬৫-৩৬৭)

আমি ঐ ব্যক্তিদের বলছি যারা মনে করে যে ‘খিলাফাতুন নুবুয়্যাহ’ সংঘটিত হবে অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বাইয়াতের মাধ্যমে, উম্মাহ যাদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। অতঃপর তারা আলেম ওলামা ও মুজাহিদ্দীনসহ সকল মুসলমানের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তারা খিলাফাহ আ’লা মিনহাজুন নুবুয়্যাহ মানে না। আমি তাদেরকে বলছি, ‘আপনারা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন তা আসলে রাফেজী মোতাহের হিলীর সাথে পুরাপুরি মিলে যায়। যারা আবু বকর রা. এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে, অল্প কিছু সাহাবা ব্যতীত আবু বকর রা. কে আর কেউ বাইয়াত দেয় নি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এমন চিন্তা দর্শনকে কড়াভাবে রদ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের বাইয়াত সংঘটিত হয়েছে উম্মাহের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম, সুধীজন ও চিন্তাশীলদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে অথবা সকল সাহাবাদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে। সুতরাং যারা মনে করে অজ্ঞাত অখ্যাত কিছু লোক উম্মাহর বিরুদ্ধে গিয়ে কাউকে বাইয়াত দিলে তা শরয়ী ভিত্তি পেয়ে যাবে, তারা প্রকারান্তরে রাফেজী মোতাহের হিলি ও তার অনুসারীদের পক্ষেই প্রমাণ দাঁড় করাচ্ছেন। তারা কি ভেবে দেখবেন কেমন জটিল সমস্যায় তারা জড়াচ্ছেন। একদিকে রাফেজীদের বিরোধীতা অন্য দিকে নিজেদের চিন্তা দর্শনে তাদেরই পক্ষে দলীল দাঁড় করানো। অদ্ভুত স্ববিরোধী কর্মকাণ্ড !! বাইয়াত সংঘটিত হয় সন্তুষ্টির মাধ্যমে, বাধ্য করে বাইয়াত হয়না।

আর এ কারণেই ইমাম মালেক রহ. মদীনা বাসীদের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়ে ছিলেন- ‘মনসুরের প্রতি তাদের বাইয়াত বাতিল। কেননা এই বাইয়াত জোরপূর্বক সংঘটিত হয়েছে।

‘ইবনে কাছীর রহ. ১৪৫ হিজরীতে মদীনা বাসী কর্তৃক মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে বাইয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, ‘মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ মদীনাবাসিকে উদ্দেশ্য করে ভাষণে বনী আব্বাসীদের অনেক দোষ উল্লেখ করার পর বলেন, সে যে অঞ্চলেই প্রবেশ করেছে সেখানকার লকেরা তাকে আনুগত্যের বাইয়াত দিয়েছে। অতঃপর অল্প কিছু লোক ব্যতীত সকল মদীনাবাসী তাকে বাইয়াত দিয়েছিল।’(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১০)

ইবনে জারীর ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে বলেন,

‘তিনি (ইমাম মালেক রহ.) তাকে (মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ) বাইয়াতের ব্যাপারে ফতোয়া দিলেন। তখন তাকে বলা হল, তারা তো ইতিপূর্বে মানসুরকে বাইয়াত দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা বাধ্য ছিলে আর বাধ্যকারীর বাইয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। তখন ইমাম মালেক রহ. এর ফতোয়ায় সবাই তার হাতে বাইয়াত হন।’(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১০/৯০)

ফুকাহায়ে কেরামের উপরোক্ত দলিলের সাথে আমরা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত একটি ঘটনাও মিলিয়ে দেখতে পারি। ঘটনাটি আব্বাসী খলিফা মুনতাসিরের হাতে বাইয়াত সংক্রান্ত। তাতারীদের হামলায় আব্বাসী খেলাফতের পতনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় মুস্তাসির বিল্লাহ ৬৫৯ হিজরীতে যখন মিসরে আগমন করেন, তখন মিসর ও শামের সুলতান রুকনুদ্দীন বেবরিস ও সুলতানুল ওলামা শায়েখ ইয়ুদ্দীন বিন আব্দুস সালামসহ নেতৃস্থানীয় আলেমরা তাঁর হাতে বাইয়াত দেন। ইসলামী ইতিহাসের এ দিনটি ছিল অবিস্মরণীয়। অথচ, খলীফা মুস্তানসিরের বাইয়াতের এক বছর পূর্বে ৬৫৮ হিজরীতে হাকেম বি আমরিব্লাহকে হলবের অধিপতি এবং স্বল্প সংখ্যক মুসলিম জনতা খলীফা হিসেবে বাইয়াত দেন। কিন্তু মিসর ও শামের সুলতান এবং বরণ্য আলেমগণ একে স্বীকৃতি না দিয়ে খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহের হাতে বাইয়াত দেন। আর এটিই ছিল যৌক্তিক। কারণ, মিসরই ছিল তখন ইসলামী শক্তির প্রাণকেন্দ্র। তাই সুলতানই মিসর, শাম, হলব, হেজাজ ও লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের হর্তাকর্তা। তাছাড়া, বিশ্ববানিজ্যিক লেনদেনও তাঁর কর্তৃত্বে ছিল। এতো ছিল বস্তুগত দিক। আর নীতিগতভাবেও তিনিই যোগ্য ছিলেন। কারণ, তিনি হারামাইন শরীফাইন ও মসজিদে আকসা-এ তিন মসজিদের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। তাছাড়া, তৎকালীন সময়েই মিসর ছিল সিংহভাগ আলেম-ওলামা ও সুখি জনতার আবাসস্থল। অতঃপর হাকেম বি আমরিব্লাহও খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহর হাতে বাইয়াত দেন।

এ ঘটনা থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, বিশিষ্ট আলেমগণ যেমন সুলতানুল ওলামা ইয়ুদ্দীন আব্দুস সালাম, হাকেম বি আমরিব্লাহর হাতে গুটি কয়েক লোকের বাইয়াতকে স্বীকৃতি দেননি। ইতিহাসের এ ঘটনাটি যদিও শরয়ী দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যাবেনা, তবে আলোচ্য বিষয় বুঝতে সহযোগিতা হবে নিশ্চয়।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আরো যা বুঝা যায় তা হল- মুস্তানসির বিল্লাহ খলিফা হিসেবে বাইয়াত লাভের পর শাসন ক্ষমতা সুলতান বেবরিসের কাছে হস্তান্তর করেন জনসমক্ষে। এ ঘটনা আমাদের এ প্রেরণা যোগায় যে, আমরাও কোন গোপন বাইয়াতের অংশ নেওয়ার পূর্বে এর যথার্থতা বিবেচনায় এনেই যেন সিদ্ধান্ত নেই। কারণ, আমরা যখন দেখি খিলাফতের দাবিদার ব্যক্তি তিনি যে কথা বলছেন, তার অনুসারীরা ভিন্ন কিছু বলছেন, তখন সঙ্গত কারণেই আমরা বিভ্রান্ত হই-তিনি কি স্বীয় অনুসারীদেরই বিরোধিতা করছেন, না নিজেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন? না তার অতি উৎসাহী অনুসারীরা তার নামে এসব আজগুবি বিষয় রটাচ্ছে?

শর্তযুক্ত বাইয়াতের অতি সাম্প্রতিক নজির স্থাপন করে গেছেন শায়েখ আবু হামজা আল মুহাজির রহ.। শায়েখ আবু উমর আল বাগদাদী রহ. এর হাতে বাইয়াত দেন এ শর্তে যে শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রহ. এর অনুগামী হতে হবে। যার ফলে শাইখ আবু ওমর আল বাগদাদী ও আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের হাতে বাইয়াতের বন্ধনে যুক্ত হয়ে যাবেন। শায়েখ আবু ওমর বাগদাদী রহ.ও তা সাদরে মেনে নেন। এ বিষয়টি স্বয়ং শাইখ আবু হামজা আল মুহাজির রহ. আমাদের পত্রযোগে অবহিত করেন।

৪। খলীফার প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য কী?

ফুকাহায়ে কেরাম খলীফার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি এখানে মাত্র একটি শর্ত উল্লেখ করবো। যা বর্তমান মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে। আর এ শর্তটিই হল আদালত। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই একটি মাত্র শর্তের মধ্যেই অন্য সকল শর্ত চলে এসেছে।

আদালত তথা ন্যায়পরায়নতা এটি এমন একটি শর্ত যা শরীয়তের প্রতিটি দায়িত্বের জন্যই অপরিহার্য। অর্থাৎ আদালত ছাড়া শরীয়তের কোন দায়িত্বই গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ কারণেই এটা বিশিষ্ট জন হওয়ার পূর্বশর্ত। এবং খলীফা প্রার্থীর জন্যও শর্ত। সুতরাং কোন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা যার আদালত প্রশ্নবিদ্ধ সে শরীয়ী কোন দায়িত্ব গ্রহণেরই যোগ্য নয়। প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তি খলীফা তো দূরের কথা বিশিষ্টজনের কাতারেই পড়ে না। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

“যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন; (তখন তার পালনকর্তা) বললেন, ‘আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব’। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌছবে না।” (সূরা বাক্বারা- ১২৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রহ. খুয়াইজ মানদাদ রহ. এর একটি উক্তি নকল করেন। খুয়াইজ মানদাদ রহ. বলেন,

“জালেম ব্যক্তি নবী হতে পারবে না। খলীফা হতে পারবেনা। হাকীম হতে পারবে না। মুফতী হতে পারবেনা এবং নামাজের ইমামও হতে পারবে না। তার বর্ণিত কোন হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয় এবং আহকামের ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।” (তাফসীরে কুরতুবি- ২/১০৯)

সুতরাং যার আদালত নষ্ট হয়ে গেছে সে শরীয়তের কোন দায়িত্ব লাভের অযোগ্য। যেমনঃ খিলাফত, ইমামত, গ্রহণযোগ্য ইমাম ও আলেম। আদালত বিনষ্ট হওয়ার উদাহরণ হল যেমন সে দায়িত্ব নেয়ার পর শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করেনা। মিথ্যা বলে। অথবা চুক্তি ভঙ্গ করে। অথবা তার আমীরের অবাধ্যতা করে। মুসলমানদের তাকফীর করার করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাদের রক্ত ও সম্মান নিয়ে খেলা করে, আর আপোষহীন সত্যবাদী আলেমগণের অবস্থান তার সম্পূর্ণ বিপরীতে।

সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আর সর্ব প্রথম আমার নিজের প্রতিই আমার অনুরোধ ও নসিহত, কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের পূর্বে নিশ্চিত হোন, সে ইসলামের শত্রু ও হত্যাযোগ্য। জেনে রাখুন, আপনার আমীর আপনাকে তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করছে কিনা? অথবা কর্তৃত্বগ্রহণ বা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে তাকে দমনের জন্য আপনি ব্যবহৃত হচ্ছেন কিনা? ভুলে যাবেন না, কিয়ামতের দিন আপনার আমীর আপনার কোনই কাজে আসবে না। আপনার রবের সামনে আপনাকেই দাঁড়াতেই হবে এবং আপনার নিজের প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে। কারো ব্যপারে নিশ্চিত হওয়া ব্যতীত তাকে তাকফীর করবেননা। চরিত্রহীন, সুযোগবাদী লোকে পরিনত হবেন না। জেনে রাখবেন, কিয়ামতের দিন আপনার হিসাব আপনাকেই দিতে হবে। আপনার আমীর আপনার কোন উপকার করতে পারবে না। বরং সে তো নিজের অন্যের মুখাপেক্ষি থাকবে। কোরআনের এই আয়াতকে স্মরণ করুন! আল্লাহ তাআলা বলেন,

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম; তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।” (সূরা নিসা- ৯৩)

রাসুল সা. এর হাদিসটি স্মরণ করুন! ওসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

“রাসুল সা. আমাদেরকে হুরাকার দিকে প্রেরণ করলেন। আমরা সেখানে সকাল বেলা এক গোত্রের উপর আক্রমণ করলাম এবং তাদেরকে পরাজিত করলাম। অতঃপর আমি এবং এক আনসার তাদের এক লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা যখন তাকে ধরাশয়ী করে ফেললাম তখন সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ল আর তখন আনসার সাহাবী বিরত হয়ে গেল আর আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলাম। অতঃপর আমরা যখন মদিনায় ফিরে আসলাম রাসুল সা. এর নিকট এই সংবাদ পৌছল। তখন রাসুল সা. আমাকে

জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওসামা! সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে! আমি বললাম সে তো আত্মরক্ষার জন্য এটা পড়েছে। কিন্তু রাসুল সা. এ কথা এতবার বলেছিলেন যে আমার মনে হতে লাগলো যে, আমি যদি এ ঘটনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে পরে মুসলমান হতাম (অর্থাৎ পূর্বে মুসলমান না হয়ে তখন মুসলমান হলে তো আমার দ্বারা এ অপরাধটি সংঘটিত হতো না)।” (সহীহ বুখারী)